দিনলিপির অনন্য শিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. অনিতা সাহা

সারবস্তু

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যরচনার পাশাপাশি সারাটা জীবন ধরেই দিনলিপি রচনা করে গেছেন। দিনলিপি রচনায় তিনি রাজাধিরাজ। তাঁর রচিত 'অভিযাত্রিক' 'বনে পাহাড়ে' প্রভৃতি ভ্রমণ দিনলিপি, 'স্মৃতির রেখা', 'তৃণাঙ্কুর' প্রভৃতি দিনলিপিগুলির মাধ্যমে আমরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও শিল্পীজীবনের পরিচয় পাই। বৃহত্তর বাংলাদেশ থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের বৃহৎ ভূখণ্ডের ভৌগোলিক পরিচয় ও সেখানকার প্রাকৃতিক ও মানবিক জগতের অন্তরঙ্গ পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে এইসব দিনলিপি গুলিতে। শুধু লেখকজীবনের ব্যক্তিগত এবং শিল্পীসত্তাই নয়, সে কালের সামাজিক জীবনেরও এক প্রামাণ্য দলিল এগুলি। লেখকের মানসবৈশিষ্ট্য, শিল্পকর্মের উৎস, ব্যক্তিগত বিচিত্র অন্তরঙ্গ অনুভূতি খুঁজে পাই তাঁর দিনলিপিগুলিতে। সর্বোপরি বিভূতিভূষণের দিনলিপিগুলি তাঁর সৃষ্টিকর্মের মতই সমানভাবে আস্বাদনীয়।

সূচক শব্দ: *দিনলিপি, ব্যক্তিসত্তা, শিল্পীসত্তা, আত্মকথন, স্মৃতিকথা, রসাস্বাদন, জীবনসত্য, মানস উদঘাটন, মমত্ববোধ, গভীর জীবনপিপাসা।*

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০ খ্রী.) একজন কালজয়ী সাহিত্যস্রষ্টা। তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ ও শিল্পস্বভাবের পরিচয় আমরা যেমন উপন্যাস ও গল্পে পাই, তেমনি তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্তরঙ্গ ও নিবিড় পরিচয় পাই তাঁর দিনলিপিগুলিতে। সাধারণ মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের নানা খুঁটিনাটি তথ্য, ঘটনা, অনুভূতিরাজিকে ডায়েরী বা দিনলিপিতে যেমন লিখে রাখে, কবি-শিল্পীর দিনলিপি তার চাইতে অনেক বেশী মূল্যবান হয়; বিশেষতঃ ব্যক্তিসত্তা-শিল্পীসত্তার উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে, সে-সব রচনা লেখকের সৃষ্টিসমীক্ষার অন্যতম উৎস। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'ইংলণ্ডের ডায়েরী' রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী', 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়েরী','জাপান যাত্রী', 'জাভা-যাত্রীর পত্র', 'রাশিয়ার চিঠি' সতীনাথ ভাদুড়ীর 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' ইত্যাদি রচনাগুলির প্রসঙ্গ এসে যায়। তবে বিভূতিভূষণের ডায়েরী যেন শিল্পীর ব্যক্তিজীবনের মানসবৈশিষ্ট্যকে আরও বেশী ক'রে উন্মোচন করে। বস্তুত ব্যক্তিসত্তার যে অন্তরঙ্গ গূঢ় পরিচয় উন্মোচন দিনলিপির অন্বিষ্ট, তা ওই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির 'ডায়েরী' তে হয়তো চোখে পড়ে না; সেদিক থেকে দিনলিপির ক্ষেত্রে যথার্থ অনন্য শিল্পী বিভূতিভূষণ।

সারাজীবনে বিভূতিভূষণ যত গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী রচনা করেছেন, তাঁর দিনলিপি সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯) প্রকাশের অনেক আগেই থেকেই তিনি দিনলিপি রচনা শুরু করেন এবং আজীবন তিনি দিনলিপি লিখে গেছেন। তাঁর দিনলিপি রচনার শুরু ১৯১৮ সালের পূর্ব থেকে এবং শেষ হয় মৃত্যুর বছর ১৯৫০ সালে, যদিও এগুলি প্রকাশিত হয় অনেক পরে।

বিভূতিভূষণের দিনলিপিগুলি, দিনলিপি ও ভ্রমণ দিনলিপি হিসাবে কালসীমা, প্রকাশকাল ইত্যাদি নানা তথ্যসহ উল্লেখ করা হল:

১। অভিযাত্রিক (ভ্রমণ দিনলিপি)

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

(চারটি পর্বের বিন্যস্ত ভ্রমণকাহিনীর কালসীমা ১৯১৭ খ্রী. থেকে ১৯৩৩ খ্রী.)[১]

প্রকাশকাল- ২২শে মার্চ, ১৯৪১ (১৩৪৭)। মিত্র ও ঘোষ, দু টাকা আট আনা, সচিত্র।

উৎসর্গ : 'কল্যাণী উমাকে'।

ক. বিভূতি রচনাবলী ২, খ. সুলভ সংস্করণ - ৪ (ভাদ্র ১৩৮৫), গ. মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত দিনের পরে দিন' (চৈত্র ১৩৯৪) এবং ঘ. বিভূতি রচনাবলী জন্মশতবার্ষিকী সং - ১ - এ সংযুক্ত, ঙ. অংশবিশেষ ''একটি ভ্রমণকাহিনী'' নামে 'বিভূতি বিচিত্রা'য় আছে।

প্রকাশকাল- ২২শে মার্চ, ১৯৪১ (১৩৪৭)। মিত্র ও ঘোষ, দু টাকা আট আনা, সচিত্র।

উৎসর্গ : 'কল্যাণী উমাকে'।

ক. বিভূতি রচনাবলী ২, খ. সুলভ সংস্করণ - ৪ (ভাদ্র ১৩৮৫), গ. মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত দিনের পরে দিন' (চৈত্র ১৩৯৪) এবং ঘ. বিভূতি রচনাবলী জন্মশতবার্ষিকী সং - ১-এ সংযুক্ত, ঙ. অংশবিশেষ ''একটি ভ্রমণকাহিনী'' নামে 'বিভূতি বিচিত্রা'য় আছে।

২. স্মৃতির রেখা (দিনলিপি) - ২৭শে অক্টোবর ১৯২৪ থেকে ২৬শে এপ্রিল ১৯২৮। প্রকাশকাল: শ্রাবণ ১৩৪৮, ১৯৪১

উৎসর্গ : 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমর আত্মার উদ্দেশ্যে।'

স্মৃতির রেখা গ্রন্থটি ক. বিভূতি রচনাবলী ১ম খণ্ড, খ. বিভূতি রচনাবলী সুলভ সংস্করণ ৪র্থ খণ্ড এবং গ. 'দিনের পরে দিন' এর অন্তর্ভুক্ত।

স্মৃতির রেখা-তে প্রকাশিত হয়নি এমন দুটি দিনের ডায়েরির অংশ (১৫.১২.২৫ এবং ২৮.৩.২৬) রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গজেন্দ্রকুমার সম্পাদিত বিভূতি স্মারক সমিতি প্রকাশিত 'বিভূতি স্মারক গ্রন্থ' তে '' 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপির দু'টি দিনের অপ্রকাশিত রচনা'' শিরোনামে গ্রন্থিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম দিনটির লিপি ''তেলাকুচার জীবন-চরিত'' নামে প্রথম ১৪০১বঙ্গাব্দে শারদীয় আনন্দমেলায় প্রকাশিত হয়েছিল।

৩. তৃণাঙ্কুর (দিনলিপি) ১৯শে জুন ১৯২৯ থেকে জানুয়ারী ১৯৩৯।

প্রকাশকাল: চৈত্র ১৩৪৯, মিত্রালয়, দু'টাকা, চার আনা।

উৎসর্গ: 'সুহৃদ্বর সজনীকান্ত দাসের করকমলে।'

ক. বিভূতি রচনাবলী- ২ খ. সু. ৪ এবং গ. 'দিনের পরে দিন' - এর অন্তর্ভুক্ত।

৪. ঊর্মিমুখর (দিনলিপি) - মে ১৯৩৫ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৩৬।

প্রকাশকাল : শ্রাবণ, ১৩৫১, মিত্রালয়।

ক.বিভূতি রচনাবলী ৩, খ. সু-৪ এবং গ. 'দিনের পরে দিন' এর অন্তর্ভুক্ত।

৫। বনে পাহাড়ে (ভ্রমণ দিনলিপি)

পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ : মৌচাক, আষাঢ় ১৩৫০- আষাঢ় ১৩৫২। গ্রন্থাকারে আশ্বিন, ১৩৫২, মিত্রালয়, দু'টাকা চার আনা।

''থলকোবাদে একরাত্রি'' লেখাটি ''থলকোবাদের চিঠি'' নামে 'বিভূতি বীথিকা' তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৬। উৎকর্ণ (দিনলিপি)

(১১ অক্টোবর ১৯৩৬ থেকে ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪১)

প্রকাশকাল : বৈশাখ, ১৩৫৩ (এপ্রিল ১৯৪৬), মিত্র ও ঘোষ।

উৎসর্গ : 'জীবনের যাত্রাপথে যারা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, সাহিত্য রচনায় দিয়েছে প্রেরণা, অভিষিক্ত করেছে আনন্দ রসধারায় — অথচ দাবি করেনি কিছু — তাদেরই কথা আজ স্মরণ করলাম।'

ক. বিভূতি রচনাবলী -৪, খ. সু- ৪, এবং গ. 'দিনের পরে দিন' — এ উৎকর্ণ দিনলিপি অন্তর্ভুক্ত।

ঘ. ''দিনলিপি'' শিরোনামে 'উৎকর্ণ' -র অংশবিশেষ 'বিভূতিবিচিত্রা'য় আছে।

ঙ. 'উৎকর্ণ'-র নির্বাচিত অংশ অমর সাহিত্য প্রকাশন প্রকাশিত 'অরণ্য মর্মর' (আশ্বিন, ১৩৭৪) সংকলনে যুক্ত।

৭। হে অরণ্য কথা কও (দিনলিপি)

জীবৎকালীন প্রকাশিত শেষ দিনলিপি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ও তৎপরবর্তী কিছুদিনের রচনা এই দিনলিপির অন্তর্ভুক্ত।

রচনাকাল: ১৯৪২-১৯৪৭ (আনুমানিক)

প্রকাশকাল: মাঘ, ১৩৫৪, জানু. (১৯৪৮) আরতি এজেন্সি, তিন টাকা।

উৎসর্গ: 'বন্ধুবর বিজয়রত্ন কবিরাজকে'।

ক.বি.র ৭, খ. সু ৪ এবং গ. 'দিনের পরে দিন' - এ 'হে অরণ্য কথা কও' অন্তর্ভুক্ত।

ঘ. 'হে অরণ্য কথা কও'— এর অংশবিশেষ 'দিনলিপি' শিরোনামে 'বিভূতিবিচিত্রা'য় আছে।

ঙ. নির্বাচিত অংশ 'অরণ্য মর্মর' (সংকলন)এ যুক্ত।

৮। অরণ্য মর্মর (ভ্রমণ দিনলিপি, সংকলন) কলকাতা, অমর সাহিত্য প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত, আশ্বিন, ১৩৭৪(১৯৬৭)।

'উৎকর্ণ' ও 'হে অরণ্য কথা কও' এর শুধু বনাঞ্চল ভ্রমণের বিবরণী সংকলিত।

৯। অন্তরঙ্গ দিনলিপি (দিনলিপি)

কলিকাতা, পুস্তক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৬ (১৯৮৩), পাঁচ টাকা।

[পত্রিকায় প্রথম প্রকাশের তারিখ জানা নেই। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পুস্তকাকারে প্রকাশের আগে 'অমৃত' পত্রিকায় সাতের দশকের প্রথম দিককার কোনো বছরে এই দিনলিপি বেরিয়েছিল] তথ্য: রুশতী সেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মে. ১৯৯৫, প.ব. বাংলা আকাডেমি কলকাতা।

পরবর্তীকালে সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত রচনা' (ভাদ্র, ১৩৯৫) বইতে 'অন্তরঙ্গ দিনলিপি ১৯৪৫' শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত হয়।

১০। বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত (দিনলিপি)

রচনাকাল: ১৯৩৩-৩৪ ও ১৯৪১।

প্রকাশকাল: বৈশাখ ১৩৯০, ১৯৮৩, নাথ পাবলিশিং।

সম্পাদনা: সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদকের উৎসর্গ: 'পূজনীয়া মেজদি রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।'

১১। বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত রচনা। (দিনলিপি)[২]

প্রকাশকাল: ভাদ্র, ১৩৯৫, কলিকাতা, মণ্ডল বুক হাউস। মানচিত্র ও হস্তলিপির ফটোকপিসহ।

সম্পাদনা: সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়।

'পথের কবি' বিভূতিভূষণ তাঁর পথিক জীবনের অভিজ্ঞতা আর জীবন উপলব্ধিকে কেবল 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ' প্রভৃতি উপন্যাসেই প্রকাশ করলেন না; স্রষ্টা, দ্রষ্টা বিভূতিভূষণের দ্বিশতাধিক ছোটগল্পের মধ্য দিয়েও সে অভিজ্ঞতা, অনুভূতির শরীক হয়েছে পাঠক। 'স্মৃতির রেখা', 'তৃণাঙ্কুর', 'ঊর্মিমুখর', 'উৎকর্ণ', 'হে অরণ্য কথা কও' প্রভৃতি দিনলিপি এবং 'অভিযাত্রিক', 'বনে পাহাড়ে' প্রভৃতি ভ্রমণ দিনপঞ্জীর মধ্যে বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা, অনুভূতির কথা অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। মূলতঃ দিনপঞ্জী আর ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে আমরা ব্যক্তি বিভূতিভূষণকে কাছে পাই, আর গল্পে উপন্যাসে যখন আমরা শিল্পী বিভূতিভূষণের সঙ্গে ব্যক্তি বিভূতিভূষণকে একযোগে পেয়ে যাই, তখন স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যেকার অন্তরঙ্গ, নিবিড় সম্পর্কটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করি।

বিভূতিভূষণের প্রথম রচনা 'উপেক্ষিতা' (১৯২২) গল্পের মাধ্যমে সাহিত্যক্ষেত্রে পথচলা শুরু করেন। তাঁর দিনলিপি রচনা আরও অনেক আগে থেকেই এবং তাঁর জীবৎকাল অর্থাৎ ১৯৫০সাল পর্যন্ত তিনি দিনলিপি রচনা করে গেছেন। 'অভিযাত্রিক' ভ্রমণ দিনলিপিতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমণকাহিনীর মালা থেকে আনুমানিক রচনাকাল উপলব্ধি করা যায়, যেমন, প্রথম পর্বের ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে একটি হল কলকাতা থেকে বেরিয়ে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে হেঁটে নিমতে গ্রামে যাওয়া। তখন বিভূতিভূষণ রিপন কলেজের ছাত্র। অতএব, সংবাদকাল ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ এর মধ্যে; আবার উপসংহার পর্বের ভ্রমণকাহিনী দুটির একটি হল বিক্রমখোল অভিযান। বাংলা ১৩৩৯ সন, এবং তাঁর মৃত্যুর পর এটি প্রকাশিত। 'বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত রচনা' তে১৯৪৩, ১৯৪৫ এবং ১৯৫০ এর দিনলিপি পাওয়া যায়।

বিভূতিভূষণের ডায়েরী রচনার কালসীমা যেমন সুদীর্ঘকাল প্রসারিত, তেমনি এর পটভূমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভূখণ্ডে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি ভারতবর্ষের বৃহৎ ভূখণ্ডের যখন যেখানে অবস্থান করেছেন, দিনলিপিতে সে অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে। তখনকার বৃহত্তর বাংলার বিভিন্ন জেলা যশোহর নদীয়া, কলকাতা, হাওড়া, হুগলী থেকে শুরু করে কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরিশাল, নোয়াখালি, ঢাকা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে তিনি ঘুরেছেন প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে। এমনকি বাংলাদেশের সীমান্ত পার করে আরাকানের মংডু শহর ও ইয়োমা পর্বতমালার অরণ্যভ্রমণের অভিজ্ঞতাও তিনি সঞ্চয় করেছেন। এসব ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর 'অভিযাত্রিক' ভ্রমণকাহিনীতে পাওয়া যায়।

'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপি গ্রন্থের ভূমিকা অংশে বিভূতিভূষণ দিনলিপি সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন তা উল্লেখযোগ্য— ''বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনে মনের মধ্যে যে অনুভূতি জাগে, আমার দৈনন্দিন লিপিতে তাহাই প্রতিবিম্বিত হয়েছে মাত্র। ... বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে বা শান্ত নিঃসঙ্গতার মধ্যে মন যেখানে নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত ছিল— এইসব রচনার সৃষ্টি সেখানে। পুস্তকে বা পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে প্রকাশের জন্য এগুলি লিখিত হয় নাই। সেইজন্য বহুস্থলে এই রচনাগুলির মধ্যে এমন জিনিস দেখা দিয়েছে, যাহা নিতান্তই ব্যক্তিগত। লিপিকৌশলের ইচ্ছাও ইহাদের মূলে ছিল না। যে অবস্থায় যেটি ছিল, অপরিবর্তিত ভাবেই সেগুলি ছাপা হইয়াছে। আমার জীবনে ব্যক্তিগত অনুভূতির অতীত ইতিহাসের দিক হইতে ইহার মূল্য

আমার কাছে যথেষ্ট বেশী।'' দিনলিপিকে তাই সাহিত্যের কোঠায় রেখে বিচার করলে হবে না। এ প্রসঙ্গে গোপিকানাথ রায়চৌধুরী তাঁর 'বিভূতিভূষণ: মন ও শিল্প' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন,— ''কোনও লেখকের গল্প উপন্যাস-কবিতাকে যে দৃষ্টি দিয়ে পড়ি, আলোচনা কবি— তাঁর ব্যক্তিগত দিনলিপিকে নিশ্চয় সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করব না। বিভূতিভূষণের অন্য অনেক লেখায় তাঁর ব্যক্তিসত্তারই ছায়া পড়েছে, সন্দেহ নেই, তবু মনে রাখতে হবে, সেগুলি সবই পাঠক সাধারণের জন্য অল্পবিস্তর সচেতন হয়ে লেখা। কিন্তু এখানে এই দিনলিপিতে সেই পাঠক নেই। সেই সচেতন শিল্পসৃষ্টির প্রয়াসও নেই। এখানে কেবল বিভূতিভূষণের নিঃসঙ্গ একক সত্তার প্রকাশ। নিজের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া, নিজেকে কেবল নিজের কাছেই মেলে ধরা।'' তাই বিভূতিভূষণের দিনলিপির যথার্থ রসাস্বাদন করতে গেলে পাঠককে মনে রাখতে হবে, এ দিনলিপি তাদের জন্য লিখিত হয়নি। এখানে পাঠক লেখকের 'নিভৃত মনের আত্মকথন' আড়ি পেতে শোনে।

বিভূতিভূষণের দিনলিপিগুলির মধ্যে একমাত্র 'স্মৃতির রেখা' ছাড়া অন্য কোনটাতেই সন-তারিখের উল্লেখ নেই। শ্রী সজনীকান্ত দাস 'ঊর্মিমুখর' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে বলেছেন, ''কোথাও সন তারিখের বালাই নাই, পাণ্ডুলিপিও আর পাওয়া যায় না। এইগুলির সঙ্গে সঙ্গে বিভূতিভূষণের জীবনের ইতিহাসও খণ্ডিত হইয়াছে।'' প্রকৃতপক্ষে দিনলিপি আর আত্মজীবনী কখনোই একধরনের গ্রন্থ নয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র (১৯১২) কথা এসে যায়। 'জীবনস্মৃতি' ও 'জীবনের ইতিহাস নয়'। কবি নিজেই জানিয়েছেন। তবে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত কবি তাঁর জীবনের প্রথম পঁচিশ বৎসরকালের জীবনকথা টুকরো টুকরো স্মৃতির ওপর ভর করে ব্যক্তিজীবন ও সৃষ্টিশীল জীবনের ক্রমপরিণতির যাত্রাকে পাঠকের সামনে রেখেছেন; এবং অত্যন্ত সচেতন শিল্পী হিসেবে তা রচনা করেছেন। ফলে পাঠকের কাছে তা সাহিত্য হয়ে উঠেছে, এলোমেলো স্মৃতিকথা নয়। রবীন্দ্রনাথের ডায়েরিগুলিও সচেতন শিল্পীর রচনা। আত্মজীবনীতে কালগত পারম্পর্য থাকে। কিন্তু দিনলিপিতে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন দিনের খুঁটিনাটি ঘটনা থেকে চিন্তা, অনুভূতিরাজির প্রকাশ ঘটে। তবু একথা মনে রাখতে হবে যে, বিভূতিভূষণের জীবন ও শিল্পবোধের জগৎ দিনলিপির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত সহজ-সরল-জীবনযাপনের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির ধারায় যোগ রয়েছে। স্মৃতির রেখা থেকে 'হে অরণ্য কথা কও' 'বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত রচনা' প্রভৃতি দিনলিপি এবং 'অভিযাত্রিক' 'বনেপাহাড়ে', 'অরণ্যমর্মর' প্রভৃতি ভ্রমণ দিনলিপিতে বিভূতিভূষণের যে মানবপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রীতি ও অধ্যাত্মভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে— তারই শিল্পিত প্রকাশ পাই পথের পাঁচালী, অপরাজিত থেকে 'অনুবর্তন', 'দেবযান', 'আরণ্যক', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'ইছামতী' প্রভৃতি উপন্যাসে এবং কুড়িটি গল্পগ্রন্থে বিন্যস্ত ২২৬টি ছোটগল্পে।

বিভূতিভূষণের প্রথম ভ্রমণ দিনপঞ্জী 'অভিযাত্রিক' মূলতঃ মানুষের অন্তর্লোক আবিষ্কারের অভিযানকাহিনীর এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় রয়েছে কতরকম মানুষের ভিড়, যারা প্রত্যেকেই দোষে-গুণে ভরা গোটা চরিত্র। এখানে প্রকৃতির মহিমা আছে অবশ্যই, তবে মানুষের মহিমা সবচাইতে উজ্জল। 'অভিযাত্রিক' এর মূল রস হল মানব রস। 'অভিযাত্রিক' এর একাধিক স্থানে বিভূতিভূষণের এই মানবপ্রীতি প্রকাশিত— ''দেশ বেড়িয়ে যদি মানুষ না দেখলুম, তবে কি দেখতে বেরিয়েছি, ... মানুষ সব জায়গাতেই আছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা অদ্ভুত জগৎ, দেখতে জানলেই সে জগৎটা ধরা দেয়, তাই দেখতেই বার হওয়া''। তবে বিভূতিভূষণ ছাঁচে ঢালা, বিতর্কবাগীশ, প্রকৃতি ও মানুষ সম্বন্ধে উদাসীন মানুষ পছন্দ করতেন না; একেবারে নির্ভেজাল, সরল-সাধাসিধে, অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত দরিদ্র মানুষগুলোকেই তিনি বেশী পছন্দ করতেন। 'অভিযাত্রিক' ভ্রমণকাহিনী চারটি পর্বে বিন্যস্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমণকাহিনীগুলোতে নানা স্থানে বিভিন্ন সময়ের ভ্রমণ দিনলিপি রয়েছে। 'অভিযাত্রিক' এর চারটি পর্বের ভ্রমণকাহিনীর সঙ্গে গ্রন্থের অবশিষ্টাংশের কালগত ব্যবধান অনেকখানি, তবু মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণ কাহিনীর সঙ্গে পূর্ববর্তীতে বাংলার বিভিন্ন স্থানে

ভ্রমণ, কেশোরাম পোদ্দারের গোরক্ষণী সভার প্রচারকের কাজে (১৯২২) পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের মধ্যে রসসঙ্গতি আছে। কারণ, প্রতিটি ভ্রমণে বিভূতিভূষণ একলা পথিক। তবে একমাত্র বিক্রমখোল অভিযান-এ (১৩৩৯) শহুরে শিক্ষিত বন্ধুদের সাহচর্য, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা, গ্রামবাসীদের বাহ্য আড়ম্বরধর্মী আতিথেয়তার আতিশয্য ছিল।

বিভূতিভূষণের ভ্রমণকাহিনি ও দিনপঞ্জীগুলিতে তাঁর রচনাকর্মের উৎস পাওয়া যায়। তাঁর রচনা যে জীবন অভিজ্ঞতাপ্রসূত তার প্রামাণ্য দলিল এগুলি। 'অভিযাত্রিক' বিভূতিভূষণের অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে তার গ্রাম জীবন এবং অরণ্য ও পাহাড়কেন্দ্রিক গল্পগুলির মধ্যে। তাঁর 'অপরাজিত'-র অপু ও মধ্যপ্রদেশের অরণ্য অঞ্চলে প্রবাসজীবন যাপন করেছিল। 'অভিযাত্রিক' এ 'চাঁদের পাহাড়' এর অন্যতম প্রধান চরিত্র ডিয়াগো আলভারেজ চরিত্রের উৎস পাওয়া যায়। 'স্মৃতির রেখা'য় ছড়িয়ে আছে 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত'র ভাঙাচোরা খণ্ডাংশ। স্মৃতিপথে বারবার স্মরণ করেছেন তাঁর বারাকপুর গ্রাম, ইছামতী নদী, মা-বাবা-স্ত্রী গৌরীকে; সেই সঙ্গে গ্রাম্য পরিবেশ, সেখানকার প্রতিবেশীজন এবং হারানো শৈশব স্মরণ করে মন ভারাক্রান্ত হয়েছে। অনেকাংশে আত্মজীবনী নির্ভর 'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিত' ২ খণ্ড তে বিভূতিভূষণের জীবনকথার অনেক অংশই। কোথাও কোথাও 'স্মৃতির রেখা'র দিনলিপির সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। ১লা বৈশাখ, ১৩৩৫ এর দিনলিপি এমনই একটি উদাহরণ যেখানে 'অপরাজিত' র অপু যখন দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর নিশ্চিন্দিপুর ফিরে এসেছে তার অনুভূতির সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে।

''কোথায় লেখা থাকবে তার তিন হাজার বৎসর পূর্বের এক বিস্মৃত অতীতের সে আনন্দভরা জীবনযাত্রা; বহুদিন পরে বাড়ি ফিরে মায়ের হাতে বেলের পানা খাওয়ার মধুময় চৈত্র অপরাহ্নটি, বাঁশবনের ছায়ায় অপরাহ্নের নিদ্রা ভেঙে পাপিয়ার যে মন মাতানো ডাক... কোথায় লেখা থাকবে বর্ষাদিনের বৃষ্টিসিক্ত রাত্রিগুলোর সেসব আনন্দকাহিনী? দূর ভবিষ্যতের যেসব তরুণ বালক-বালিকার মনে এই কালবৈশাখী নব আনন্দের বার্তা আনবে, কোনপথে তারা আসবে?''

'স্মৃতির রেখা' দিনলিপিতে বিভূতিভূষণের বাল্যজীবনের স্মৃতিচারণা, বনগাঁ স্কুলে ভর্তি, পিতা মহানন্দর মৃত্যুর কথা জানা যায়। জানা যায়, ১৯০৮ সালে তিনি বনগাঁ-এ বোর্ডিং এ চলে যান। ১৯২৭- ৯ ডিসেম্বর 'স্মৃতির রেখা' তে লিখছেন ''অনেককাল আগে ১৯০৮ সালে সন্ধ্যায় বেহারী ঘোষের বাড়ী মানিকের গান হ'ল— পরদিন জিনিসপত্র নিয়ে সেই যে বোর্ডিং এ এলাম- কী ক্ষণে বাড়ীর বাইরে পা দিয়েছিলাম জানি না— সেই বিদেশবাস শুরু হোল। পরে আর বারাকপুরকে বারমাসের জন্য একবারও পাইনি— হারিয়ে হারিয়ে পেয়ে আসছি— কত জগদ্ধাত্রী পূজার ছুটিতে, গুড ফ্রাইডের ছুটিতে, বড়দিনে, পূজায়—শনিবার পেয়ে এসেছি ছেলেবেলায়— এখনো অন্যভাবে পাই।'' বিভূতিভূষণের এই মাতৃভূমির প্রতি, মায়ের প্রতি যে অপ্রতিরোধ্য টান তার প্রকাশ আছে দিনপঞ্জীর পাতায় পাতায়। আর এইসব অনুভূতিই শিল্পরূপ পেয়েছে 'পথের পাঁচালী' সহ তার বহু গল্পের কাহিনীতে।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ 'স্মৃতির রেখা' তে এমনই স্মৃতিচারণা -

''এই থানা, সামনের মৃণাল-ফোটা বৃহৎ পুকুরটা, এই কি সুন্দর হাওয়া— সন্ধ্যার পর এই থানার আয়না বসানো টেবিলটার ধারে বসে লিখছি— এ সব যেন কোথায় এসে পড়েছি!— সেই-সেইসময় পাকাটি হাতে শিবাজীর মতো যুদ্ধ-যাত্রা মনে পড়ে—সেইমার তালের বড়া ভাজা, কলকাতা থেকে এসে খাওয়া— বাবার দেশভ্রমণের বাতিক— সেই বড়দিনের সময় আমবনের কাছে বেড়ানো — কত পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে। ভগবান, তুমি সামনে টেনে নিয়ে যাচ্ছ—সামনে নিয়ে চল। সেই সোনারপুরে এমন সময়ে মা মারা যাওয়ার দিনটি থেকে খুব নিয়ে চলেছ— সেই কিশোরীবাবুর বাড়ি, জ্যোৎস্নাময় পূর্ণিমার কথা মনে পড়ে।''

বিভূতিভূষণের স্বদেশপ্রীতিমূলক ঘরে ফেরার গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'বংশলতিকার সন্ধানে', 'যাচাই', 'পৈতৃক ভিটা', 'দ্রবময়ীর কাশীবাস', 'বুধীর বাড়ী ফেরা', 'সিঁদুরচরণ', 'পিদিমের নীচে' প্রভৃতি।

'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' তে দুঃখ আছে, দারিদ্র আছে, আছে সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র। লেখক দারিদ্রের কথা শোনালেও জীবন যে দরিদ্র নয়, সেই সত্যটিকে এই উপন্যাসে তুলে ধরেন। এই জীবনসত্যটি তাঁর সমস্ত রচনায় বিধৃত হয়ে আছে। বিভূতিভূষণ 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসে পার্থিব জীবনে অলৌকিকতার কথা লিখেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর আরও অনেক কথা বলবার ছিল। তাই 'দেবযান' (দেবতার কথা) লেখার কথা ভেবে রেখেছিলেন, সেই আভাস 'স্মৃতির রেখা' তে পাওয়া যায়। ১৫ই মার্চ ১৯২৮ তিনি লিখছেন, ''... 'দেবতার ব্যথা'য় এইরকম লিখতে হবে যে ... অসীম অন্ধকারে তাদের যাত্রা, দুর্জয় সাহসী Pioneers"! 'স্মৃতির রেখা'তে আরও দুটি উপন্যাস রচনা করবেন ব'লে কল্পনা করে রেখেছিলেন— সে দুটি উপন্যাস হল 'আরণ্যক' ও 'ইছামতী'। তাঁর 'উৎকর্ণ' ও 'হে অরণ্য কথা কও'— দিনলিপিতেও 'ইছামতী' উপন্যাস রচনার সংকল্প প্রকাশ পেয়েছে। 'স্মৃতির রেখা'য় ১/৩/১৯২৮ এর দিনলিপিতে তিনি লিখেছেন 'ইছামতী' রচনার সংকল্প— ''... আজ পাঁচশত বছর ধ'রে কত গৃহস্থ এল, কত হাসিমুখ শিশু প্রথম মায়ের সঙ্গে নাইতে এল,— কত বৎসর পরে বৃদ্ধাবস্থায় তার শ্মশান শয্যা হল ঐ ঠাণ্ডা জলের কিনারাতেই, ঐ বাঁশবনের ঘাটের নীচেই। কত কত মা, কত ছেলে, কত তরুণ-তরুণী সময়ের পাষাণ বর্ম্ম বেয়ে এসেছে গিয়েছে মহাকালের বীথিপথ বেয়ে। ঐ শান্ত নদীর ধারে ঐ আকন্দ ফুল, ঐ পাটা শেওলা, বনঝোপ, ছাতিম বন। এদের গল্প লিখবো, নাম হবে ইছামতী।'' 'অপরাজিত' উপন্যাসেও বিভূতিভূষণ ইছামতী প্রসঙ্গে একই ধরনের বর্ণনা করেছেন। ''... কত গৃহস্থ আসে, কত গৃহস্থ যায়— কত হাসিমুখ শিশু মায়ের সঙ্গে নাহিতে নামে, আবার বৃদ্ধাবস্থায় তাহাদের নশ্বর দেহের রেণু কলস্বনা ইছামতীর স্রোতোজলে ভাসিয়া যায়— এমন কত মা, কত ছেলেমেয়ে, কত তরুণ-তরুণী মহাকালের বীথিপথে আসে যায়— অথচ নদী দেখায় শান্ত, স্নিগ্ধ, ঘরোয়া, নিরীহ।''[৩]

১৯২৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপিতে 'আরণ্যক' রচনার সংকল্প নিয়ে লিখছেন— ''এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো— একটা কঠিন শৌর্য্যপূর্ণ, গতিশীল; ব্রাত্য জীবনের ছবি'। গ্রন্থাকারে 'আরণ্যক' প্রকাশ পায় আরও এগারো বছর বাদে ১৯৩৯-এ। এই এগারো বছরে যাত্রাপথে আরও কতশত উপকরণ আহরণ করেছেন বিভূতিভূষণ; কল্পনার জগতে, মানুষ আর প্রকৃতির সাহচর্যে। সাফ হয়ে যাওয়া জঙ্গল, দেশের প্রান্তর থেকে তাঁরই হাত ধরে সবুজের বিনষ্টি, বিভূতিভূষণকে যে গভীর যন্ত্রণায় বিদ্ধ করেছিল— তাই তিনি শিল্পে গাঁথলেন আরণ্যক উপন্যাসে। বিভূতিভূষণের রচনা যে কতখানি বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসূত, এই দিনলিপি গ্রন্থগুলিই তার প্রমাণ। স্মৃতির রেখাতে ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ এ বিভূতিভূষণ লিখছেন, ''নভেলে এইসব শৈশব-কালের স্মৃতিরই পুনরাবৃত্তি করছি মাত্র— কারণ মনের অভিজ্ঞতা, জীবনের অভিজ্ঞতা ছাড়িয়ে কোনো লেখকই যেতে পারেন না— গেলেই সেটা কৃত্রিম, Tour de force হয়ে পড়বে'।

'তৃণাঙ্কুরে'র প্রথম সংস্করণে মিত্র ও ঘোষের কর্ণধার সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র এই গ্রন্থ সম্পর্কে একটি পরিচায়িকা রচনা করেছিলেন:

> ''বর্তমান গ্রন্থখানি ঠিক উপন্যাসও নয়, কিংবা বিভূতিভূষণের আত্মজীবনীও নয়। শিল্পীর মনে ক্ষণে ক্ষণে যে সকল চিন্তার উদয় হইয়াছে, কিংবা দৈনিক জীবনযাত্রার সূত্রে যেসব ঘটনা তাহাকে আঘাত করিয়াছে, বিস্মিত করিয়াছে বা সচেতন করিয়াছে, সেইসব ঘটনা ও চিন্তার কথাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই হিসাবে ইহাকে তাঁহার সাহিত্যজীবনের ইতিহাসই বলা চলিতে পারে, যদিও সমস্তটা

জড়াইয়া ইহা এক স্বতন্ত্র, অপূর্ব সাহিত্যে পরিণত করিয়াছে। যে সময়কার ইতিবৃত্তের উপর বর্তমান বইখানির ভিত্তি, সে সময়েই 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' লেখা চলিতেছিল। সে হিসাবে এই বইখানি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর স্থান অধিকার করিবে। শুধু তাহাই নয়, বাংলা-দেশের সব গণ্যমান্য লোক এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিকরা ভিড় করিয়া আসিয়াছেন এই বইটিতে, তাহাদের একটা নতুন ধরনের অন্তরঙ্গ পরিচয় মিলিবে ইহার মধ্যে।''

'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপির রচনাকাল ১৯শে জুন, ১৯২৯ থেকে জানুয়ারী ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ। এই দশবৎসরকালের দিনলিপিতে স্বাভাবিকভাবেই বিভূতিভূষণ তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর আনুপূর্বিক বিবরণ দেননি, জীবনপথে চলতে গিয়ে যেসব ঘটনা চিন্তা ও অনুভূতিক প্রভাবিত করেছে, তাই-ই তিনি নিজের ও পাঠকের জন্য অক্ষরবন্দী করেছেন। তাই বহির্জীবনে একান্ত উদাসীন বিভূতিভূষণের মনোজগতের শান্ত, নিঃসঙ্গতার অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে এই দিনলিপিতে। এখানে তিনি অকপটে মনের কথা বলেছেন, সে কারণে রচনাশৈলীতে অনেক ত্রুটি রয়ে গেছে। জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিভূতিরচনাবলী- ২ খণ্ডের ভূমিকা অংশে এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'দিনলিপি' পাঠকের সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে তিনি যা পড়তে বলেছেন তা বক্তব্য-প্রধান রচনা, রীতিপ্রধান বা শৈলীপ্রধান নয়। 'তৃণাঙ্কুর'- এর উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি নয়, মানস উদঘাটন; এবং সে উদ্দেশ্যে সফল হয়েছে।

'তৃণাঙ্কুর'-এ বিভূতিভূষণের অনুভূতিক্ষেত্র প্রকৃতিকেন্দ্রিক এবং মানবকেন্দ্রিক। আর এই প্রকৃতিজগৎ ও মানবজগৎ - দুইই তাদের উদ্দেশ্য ও অস্তিত্বের রস সংগ্রহ করে ঐশ্বরিক প্রেরণার উৎস থেকে। বস্তুতঃ ঈশ্বর, মানুষ ও প্রকৃতি— এই ত্রিতত্ত্ব - সমন্বিত চেতনা এই দিনলিপিতে সমানভাবে পাই। তিনি ঈশ্বরকে বলেছেন— 'সুমহান শিল্পী'— যিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষ কোটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ তুচ্ছ-মহৎ সবরকম উপাদানের সমন্বয় করে গড়েছেন এই বিরাট জীবনকে। এই দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ যে অপার্থিব আনন্দ পেয়েছেন— সেই আনন্দময় অনুভূতির স্বরূপ বুঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন মাত্র - তাঁর অনুভূতিকে ছড়িয়ে দিতে চান পাঠকের মাঝে।

'তৃণাঙ্কুর', 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'র ভাষ্যগ্রন্থ। দুখানি উপন্যাসের নায়ক অপুর জীবন তো তার ক্রমবর্ধমান চেতনার ইতিহাস। 'অপরাজিত'র শেষ ফর্মার প্রুফ দেখে আসার পর বিভূতিভূষণের অনুভূতি— 'আজ সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। অপু, কাজল, দুর্গা, লীলা— এরা সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরে আমার আপনার লোক হয়ে পড়েছিল।' অপু সম্পর্কে বলেছেন— 'অপুকে জন্ম থেকে ৩৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি কলমের ডগায় সৃষ্টি করেচি। তাকে ছাড়তে সত্যিকার বেদনা অনুভব করচি— তবে সে ছিল অনেকখানিই আমার নিজের সঙ্গে জড়ানো, সেইজন্যে বেশি কষ্ট হচ্চে বিদায় দিতে কাজলকে, লীলাকে, দুর্গাকে, রানুদিকে— এরা সত্যসত্যই কল্পনাসৃষ্ট প্রাণী। কোনোদিকে এদের কোনো ভিত্তি নেই এক আমার কল্পনা ছাড়া।''[৪] 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপিতে, বিভূতিভূষণের বারাকপুর গ্রামের প্রতি প্রাণের টান ঝরে পড়েছে। মা-বাবা, আত্মীয় পরিজনকে বারবার স্মরণ করেছেন।

'তৃণাঙ্কুর' এ বিভূতিভূষণের মনে পড়েছে বাল্যদিনের সুখ-দুঃখের কথা, পিতা-মাতাকে বারবার স্মরণ করেছেন। পথের পাঁচালী প্রকাশের দিনে পিতাকে স্মরণ করে লিখেছেন— 'আজ মহালয়া, পিতৃতর্পণের দিনটা, কিন্তু আমি তিল তুলসী তর্পণে বিশ্বাসবান নই— বাবা রেখে গিয়েছিলেন, তার অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবার জন্য, তাই যদি করতে পারি, তার চেয়ে সত্যতর কোনো তর্পণের খবর আমার জানা নেই।' আনন্দের দিনে বহু স্মৃতি ভিড় করে এসেছে—পোড়ো ভিটা, সেখানকার কত হাসি-কান্না-বেদনা; কত অপূর্ব জীবনোল্লাস। তিনি মনে করেন, তার সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণার মূলে এদেরই অবদান রয়েছে। তাই বার বার ছুটে গেছেন তার প্রিয় স্বদেশভূমি বারাকপুরে। আত্মীয়-পরিজন কাউকে ভোলেননি, সবার প্রতি দায় কর্তব্য পালন থেকে

শুরু করে স্বদেশের জল-মাটি -গাছপালা-নদী আর সর্বোপরি গ্রাম্য দেশজ মানুষজনের প্রতি অফুরন্ত ভালবাসার টানে বারে বারে ছুটে যাওয়া;— তারই অনুভূতিময় প্রকাশ আছে দিনপঞ্জীগুলিতে। এই অনবরত ভ্রাম্যমান জীবনের পথিক বিভূতিভূষণ জগতের অপূর্ব গতির রূপ দেখেছেন, তারই বাঙ্ময় স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে দিনলিপিতে।

ঊর্মিমুখর দিনলিপি রচনার সময়কাল দেড়বছর। মে ১৯৩৫-সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ পর্যন্ত। এইসময়ে বিভূতিভূষণ কলকাতা থেকে দেশের বাড়ী যাতায়াত থেকে শুরু করে, কলকাতার বাইরে নানাস্থানে ভ্রমণ করেছেন। প্রকৃতির প্রতি আত্মিক টান বিভূতিভূষণের লেখায় তথা জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গ্রামে গিয়ে সল্‌তেখাগী আমগাছটা ঝড়ে পড়ে গেছে দেখে বেদনায় কাতর হয়েছেন। ঊর্মিমুখর-এ লিখেছেন— ''সল্‌তেখাগীর সঙ্গে আর দেখা হবে না। ওকে কেটে নিয়ে জ্বালানী করবে এবার হাজারী কাকা। সত্যিই আমার চোখে জল এল। যেন অতি আপনার নিকট আত্মীয়ের বিয়োগ অনুভব করলুম। গাছপালাকে সবাই চেনে না। এতদিনের সল্‌তেখাগী যে ভেঙে গেল, তা নিয়ে আমাদের পাড়ার লোকের মুখে কোনো দুঃখ করতে শুনিনি। পথের পাঁচালীতে সলতেখাগীর কথা লিখেচি। লোকে হয়তো মনে রাখবে কিছুদিন।'' বিভূতিভূষণের দিনলিপির পাতায় এরকম কত রকম গাছপালা, তৃণলতার পরিচয় যে আমরা পাই, তার শেষ নেই। তিনি নিজে যে শুধু ভালবেসেছেন তা নয়, পাঠক ও জনসাধারণের ভালবাসার চোখটাকেও খুলে দেন। এই দিনলিপিতে বহু সাধারণ মানুষের জীবনযাপন ব্যথা বেদনার কথা লিখে পাঠকদেরও শরীক করেছেন, যদিও এ তাঁর একান্ত নিজের কাছে থাকার সামগ্রী ছিল। আমাদের সৌভাগ্য যে এই বিপুল জীবনের ও জগতের অসাধারণ অনুভূতিময় চিত্র আমরা নাগালের মধ্যে পেয়েছি। এখানে বিভূতিভূষণের দূরসম্পর্কীয় পিসিমার বাড়ী ভ্রমণের কথা আছে, যাকে নিয়ে গল্পও আছে 'বড় দিদিমা'। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসের উৎস পাওয়া যায় ঊর্মিমুখর-এ। কিছুদিন তিনি বিহারের (বর্তমান ঝাড়খণ্ড) বরমডেরা, কুলামাতা, সুবর্ণরেখা নদীর ধার, মহুলিয়া, চাঁইবাসা, টাটানগর, গালুডি, রাখা মাইনস, নীল ঝরণা উপত্যকা ঘুরেছেন। এখানকার ভূমিশ্রী বিভূতিভূষণকে মুগ্ধ করে, কিন্তু এই পাহাড়-জঙ্গলের সৌন্দর্য পেরিয়েও বিভূতিভূষণের মন পড়ে থাকে তাঁর গ্রাম ইছামতীর দেশ বারাকপুরে। বাড়ীতে এসে কুঠির মাঠে বেড়াতে গিয়ে মাঠের বনশোভা দেখে তিনি উপলব্ধি করেছেন, '... আমাদের এ অঞ্চলের গাছপালার বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য সিংভূম সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়ার অরণ্যের শোভার অপেক্ষা অনেক বেশী। কত কি লতা, কত কি বিচিত্র বনফুল, কত ধরনের পত্রবিন্যাস— এত বৈচিত্র্য কোথায় ওসব দেশের অরণ্যে?'[৫]

বাংলাদেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিভূতিভূষণের মনে হয়েছে 'বাংলাদেশটাতে যদি আজ সারেণ্ডা রিজার্ভ ফরেস্টের মতো একটা অরণ্য গড়ে উঠত, তার বনবৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য এবং নিবিড়তা অনেক বেশি হত শ্রীনগরের ও ছঘরের পথের ধারের বন দেখে এ ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছে।' (পৃ. ৩০০) ঊর্মিমুখর, দিনের পরে দিন।

'তৃণাঙ্কুর', দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ যেমন তাঁর সমসাময়িক বন্ধু-সাহিত্যিক সুধীজনের কথা লিখেছেন, ঊর্মিমুখরেও এসেছে অনেকের কথা। গ্রামজীবনের মানুষের সুখ-দুখের কথা পড়তে পড়তে সেকালের সমাজজীবনের ছবি পাঠকের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। সেকালের সমাজের প্রামাণ্য দলিল এগুলি। ডায়েরীর শেষে লিখছেন— ''এই ডায়েরিটি শেষ হয়ে গেল। আমার জীবনে এই দেড় বছর বড়ই আনন্দের। পরিপূর্ণ আনন্দের। কত কি পেলুম এই দেড় বছরে। সবকথা ডায়েরিতে লেখা যায় না। যা এখানে লিখলুম না তা রইল আমার মনের গভীর গোপন তলে। কর্মহীন অবকাশ মুহূর্তে তাদের চিন্তা আমায় আনন্দ দেবে।''

'বনে পাহাড়ে' দিনলিপির আকারে লেখা বিভূতিভূষণের দ্বিতীয় ভ্রমণকাহিনী। প্রথম ভ্রমণকাহিনী 'অভিযাত্রিক'। 'বনে পাহাড়ে'র প্রথম দিকে ঝাড়গ্রামের উল্লেখ আছে (১৯৪২-৪৩সাল)। সেসময়ে বিভূতিভূষণের শ্বশুর স্বর্গত ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

তখন সরকারী কর্মসূত্রে ঝাড়গ্রামে থাকতেন। তখন একাধিকবার তিনি ঝাড়গ্রামে এসেছেন এবং সেখানে অবস্থানকালে সাবিত্রী মন্দির, রাজবাড়ী, ভ্রমণ করেছেন এবং এখানকার শালবনে ভ্রমণ করতে খুব ভালবাসতেন। ঝাড়গ্রাম ছাড়া, ধলভূম, কোলাহান বনবিভাগের বনভূমি, হিড্‌নি জলপ্রপাত ও সেরাইকেলা ভ্রমণের বর্ণনা করেছেন। তাঁর বিভিন্ন সময়ে ভ্রমণের সহযোগী ছিলেন বিহার সরকারের ধলভূম বনবিভাগের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার যোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হা, কখনো সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বন্ধু সুবোধ ঘোষ এবং আরও অনেকে। কখনো কখনো একাকী ভ্রমণ করেছেন তিনি। তারই বর্ণনা আছে 'বনে পাহাড়ে' ও 'হে অরণ্য কথা কও' গ্রন্থে। বিভূতি রচনাবলী ৫ম খণ্ড - এর ভূমিকায় শ্রী রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এই ডায়েরী গ্রন্থ সম্পর্কে লিখেছেন—

''বিভূতিভূষণের সাতখানি ডায়েরি-গ্রন্থের মধ্যে বনে-পাহাড়ে প্রকাশকালের দিক থেকে পঞ্চম। রচনার উৎকর্ষে বাকী ছয়খানির যে কোন একটি ইহা হইতে উৎকৃষ্ট। তবু বলি, ''বনে পাহাড়ে'' বড় অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-বস্তু নয়। ... সার্থক ডায়েরি Personal essay-র সগোত্র। Charles Lamb এর কাছে যখন তাহার প্রকাশক Essays of Elia গ্রন্থের জন্য একটি Preface চাহিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহার Essay গুলিই Preface, অর্থাৎ পাঠকের কাছে যাহা বলার তিনি তাহার রচনার মধ্যেই বলিয়াছেন। Montaigne এর Essays পড়িয়া ফরাসীদেশের রাজা মুগ্ধ হইয়া লেখককে বলিয়াছিলেন: 'তোমার লেখা আমার বড় ভাল লাগিয়াছে।' Montaigne উত্তরে বলিলেন, 'মহাশয়, আমার লেখা যখন আপনার এত ভাল লাগিয়াছে, তখন আপনার আমাকেও খুব ভাল লাগিবে, কারণ আমি আর আমার লেখা অভিন্ন।' শ্রেষ্ঠ ডায়েরিগ্রন্থ একটি ব্যক্তিত্বের কথা। সেকথা যে একের কথা হইয়াও সকলের কথা হইয়া ওঠে তাহা ঐ ব্যক্তিত্বেরই মাহাত্ম্য, যে ডায়েরি বা স্মৃতিকথার এই লিরিকবস্তু নাই তাহা নীরস ঘটনাপঞ্জী মাত্র, সাহিত্যে তাহার স্থান নাই।'' বিভূতিভূষণের 'বনে পাহাড়ে' শুধু নয়, সব দিনপঞ্জীতেই তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটেছে, যা পাঠককে প্রতি সহজেই এক ভালবাসাবাসির জগতে পৌঁছে দেয়।

'উৎকর্ণ' দিনলিপি (১১ অক্টোবর, ১৯৩৬ থেকে ১৬ নভেম্বর ১৯৪১) সময়কালের রচনা। রচনার শুরুতে বিভূতিভূষণ লিখছেন— 'আমি এই ডায়েরীটা লিখব এমনভাবে যে আমার মনের সকল গোপনীয় কথাই এতে থাকবে, কিছু চেপে রাখবো না। কাজেই কথাগুলো সব লিখতে হবেই।' এ-কথা তিনি ঊর্মিমুখরে বলতে পারেননি। তখন লিখেছিলেন সব কথা ডায়েরিতে লেখা যায় না। এখানে বার বার স্ত্রীর কথা স্মরণ করেছেন। ১১ অক্টোবর ১৯৩৬ স্ত্রী গৌরীদেবীকে স্মরণ করে লিখেছেন।

''অনেককাল আগে আজ প্রায় আঠারো বছর আগে এই দিনটিতে পূজোর ছুটি উপলক্ষ্যে গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে বাড়ি গিয়েছিলুম, তখন নতুন বিয়ে হয়েচে, তার আগে কতকাল দেখা হয়নি। গিয়েছিলুম অবশ্যি আগের দিন, কিন্তু দেখা হয়নি, বেশী রাত হয়ে গিয়েছিল বলে। আজই রাত্রে প্রথম দেখা হয়। সেই পূজোর সময়েই বাপের বাড়ী থেকে নিতে এল তাকে, আমরা পাঠিয়ে দিলুম, কিন্তু মাসখানেক পরে বাপের বাড়ীতে সে মারা গেল। সেইজন্য আজকার দিনটি আমার মনে আছে, থাকবেও চিরকাল।'' এই একান্ত ব্যক্তিগত বেদনার কথা তুলে ধরেছেন উৎকর্ণ দিনলিপিতে।

উৎকর্ণ দিনলিপিও অনেকক্ষেত্রে সময় ও তারিখবিহীন খণ্ডিত দিনলিপি। এই দিনলিপিতে হুগলী জঙ্গীপাড়া স্কুলে যোগদান, ভাগলপুর ভ্রমণ ও চাকরীর কথা জানা যায়। তাঁর প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা'র উৎস 'বিপিনের সংসার''আরণ্যক' উপন্যাসের উৎস জানা যায় উৎকর্ণ দিনলিপিতে।

'হে অরণ্য কথা কও' বিভূতিভূষণের ষষ্ঠ এবং শেষতম মুদ্রিত দিনলিপি। ইহার পরে আর বিভূতিভূষণের জীবিতকালে কোনো দিনলিপি পুস্তক আকারে মুদ্রিত হয় নাই।' (গ্রন্থপরিচয়, বি.র. ষষ্ঠ খণ্ড, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়)

এই দিনলিপিতে অরণ্যভ্রমণের অভিজ্ঞতার অংশগুলোই প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর অক্টোবর এর পর

থেকে এই দিনলিপি লেখার শুরু এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষে রচনা শেষ করেন। এইসময় বিভূতিভূষণ দ্বিতীয় স্ত্রী রমা দেবীর (ডাকনাম কল্যাণী) সঙ্গে সংসার করছেন। ১৯৪২সালের গোড়ার দিকে বারাকপুরের বাড়ী পুনর্নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেছেন। ১৯৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বহুবার সস্ত্রীক ঝাড়গ্রামে এসেছেন। অরণ্যভ্রমণের ও অরণ্যবাসের অভিজ্ঞতা যেমন আছে, তেমনি আছে তাঁর বারাকপুরের প্রতি অপ্রতিরোধ্য টান। বিভূতিভূষণের মত কল্যাণীও বলতেন..." আজই চলো বারাকপুর যাই, ইছামতী টানচে।" জঙ্গল এবং গ্রামবাংলার অপরূপ রূপ ধরা পড়েছে এই দিনলিপিতে। মি. সিনহার মোটরে ঝাড়খণ্ডের বহু অরণ্য-পাহাড়ে ভ্রমণ করেছেন। ভাই নুটুর বাসা তখন ধলভূমগড়ে। স্ত্রীকে নিয়ে আশপাশের বহরাগড়া হিড্‌নি জলপ্রপাত, সারেণ্ডা বনভূমি ভ্রমণের মূল্যবান অভিজ্ঞতা আছে। এই অরণ্যভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লেখক বলছেন,—'আমার মনে হয় সারেণ্ডা ভ্রমণের মন ছিল আমার বহুদিনের। তাই তিনিই দয়া করে যোগাযোগ ঘটালেন। এ এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা জীবনের। সেই শৈলশীর্ষে রাঙা রোদ, ঘন বনে সেই ঝরণার জলপতন ধ্বনি, সেই প্রাচীন বনস্পতি-শ্রেণী, দূরে দূরে অগণ্য শৈলমালার সমারোহ— সেই সুগন্ধি বন্য কুসুমরাজি - এসব যদি আমি না দেখতুম, মনের মধ্যে এর ছবি না এঁকে রাখতুম— তবে আমার জীবন ফাঁকা থেকে যেত। হে বিশ্বশিল্পী, তোমাকে এই করুণার জন্য ধন্যবাদ।' (পৃ. ৫৩৮, হে অরণ্য কথা কও। দিনের পর দিন) সারেণ্ডায় কত ভালো ভালো জায়গা দেখেছেন, তার ২৬টি তালিকা এখানে রেখেছেন লেখক। গভীর অরণ্যের সৌন্দর্য পাঠকেরা চাক্ষুষ করে মুগ্ধ হয়; সেই সঙ্গে বনভূমির অন্তর্গত জঙ্গলের দেহাতী খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গে পরিচিত করে দেন বিভূতিভূষণ। এ এক অপূর্ব জীবানুভূতি। এইসব আরণ্যক মানুষের পরিচয় মেলে বিভূতিভূষণের অরণ্য পাহাড়কেন্দ্রিক গল্পে, আরণ্যক উপন্যাসে।

বিভূতি রচনাবলী ৭ম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় অংশে চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, '১৩৭৩ বঙ্গাব্দে 'হে অরণ্য কথা কও' এবং 'উৎকর্ণ' দিনলিপির নির্বাচিত অংশ লইয়া বিভূতিভূষণের 'অরণ্যমর্মর' নামক অরণ্যভ্রমণের সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অরণ্য ভ্রমণের নির্বাচিত অংশ বর্তমান নিবন্ধকারই সংকলন করিয়াছেন।' মূলতঃ পাঠক সাধারণের কাছে বিভূতিভূষণের অরণ্যভ্রমণের নির্বাচিত অংশকেই নিবন্ধকার তুলে দিতে চেয়েছেন, অরণ্যভ্রমণের স্বাদগ্রহণের উদ্দেশ্যে। সংকলনটি বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পর প্রকাশিত। বিভূতিভূষণের 'অন্তরঙ্গ দিনলিপি' (১৯৭৬), 'বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত দিনলিপি' (১৯৮৩) এবং 'বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত রচনা' (১৩৯৫) গ্রন্থ তিনটিও বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। অন্তরঙ্গ দিনলিপির রচনাকাল ১৯৪৫, বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত দিনলিপির রচনাকাল ১৯৩৩-৩৪ এবং ১৯৪১, আর বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত রচনাংশে মূলতঃ ১৯৪৫ এর ১৩ই জানুয়ারী থেকে ৬মে পর্যন্ত চারমাসের এবং ৯ ডিসেম্বর দিনটির দিনলিপি আছে, বাকি অংশ অন্তরঙ্গ দিনলিপিতে পূর্বেই গ্রন্থিত হয়েছে।

বিভূতিভূষণের দিনলিপিগুলি পাঠ করতে গিয়ে পাঠক উপলব্ধি করতে পারে বিভূতিভূষণের বিরাট ব্যক্তিসত্তাকে, যা অত্যন্ত গভীর জীবনপিপাসা ও অপরিমেয় বিস্ময়বোধ নিয়ে জগৎ ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করে চলেছে। তাঁর বর্ণনার ভঙ্গি অত্যন্ত সহজ, সরল অনাড়ম্বর, ঠিক যেন বিভূতিভূষণের জীবনেরই মত। কোন যুদ্ধ, সংঘাত, দ্বন্দ্ব, বিচ্ছেদ, মৃত্যুতে তিনি থেমে যেতে চান না। বরং যুদ্ধকালীন সময়েও দেখেন রাঙ্গা মেঘস্তূপ, সাইবাবলা গাছের ফাঁকে রাঙ্গা রোদ, সবুজ কচুরিপানার ওপরে চরে বেড়াচ্ছে সাদা বকের দল। তিনি খুঁজে ফেরেন জটিলতা মুক্ত এক সহজ-সরল-অনাড়ম্বর জীবনের স্বাদ। দিনলিপি থেকেই জানা যায়, কতকাল আগে থেকেই মনের মধ্যে উপন্যাস, ছোটগল্পের প্লট মাথায় এসেছে। দীর্ঘকাল ধরে স্মৃতির রসে জারিত হয়ে তার সেগুলি শিল্প আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বিভূতিভূষণের ব্যক্তি জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য-একটু ঢিলেঢালা গোছের, যাকে বলে

অগোছালো প্রকৃতি। এই প্রকৃতির সর্বোত্তম প্রকাশ তাঁর দিনলিপিগুলি, কিন্তু আবেগে-মননে-দার্শনিক জীবনবোধে তাঁর রসগ্রহণে জুড়ি নেই। দিনলিপির এই বৈশিষ্ট্য তাঁর উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' তে এবং বিশেষ করে তাঁর 'আরণ্যক' উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠা জুড়ে আছে। গঠনরীতিতে এই শিথিলতা থাকা সত্ত্বেও পাঠকের হৃদয়ের দরবারে তার রচনা রাজকীয় সম্মান আদায় করে নিয়েছে। বিভূতিভূষণের দিনলিপিগুলিতে আছে কালচেতনা ও গতিচেতনা, সেইসঙ্গে মনের নস্টালজিক প্রবণতা। বার বার তিনি ঘুরে ফিরে দেশের জল-মাটি-হাওয়ার মাঝে প্রবেশ করতে চান। স্বদেশের প্রতি টান, ঘরে ফেরার আকুতি বিভূতিভূষণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর সবচাইতে বড় বিষয় হ'ল বিভূতিভূষণের এই মাটির পৃথিবীর প্রতি মমত্ববোধ, সাধারণ মানুষের অন্তরের কথা জানার ও বোঝার ব্যাকুল বাসনা ও আত্মিক যোগ ধরা পড়েছে তাঁর দিনলিপিগুলিতে। পৃথিবীর বুকে যেমন প্রতিটি লতা-গুল্ম, বৃক্ষ-ফল-ফুল-পাখী-জীবজন্তুকে নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করেছেন তিনি, তেমনি মহাবিশ্বের মাঝে এদের রহস্যময় যোগসূত্রও খুঁজে পেয়েছেন। তিনি নিজেকে এই মহাবিশ্বের মাঝে এই মহাপ্রকৃতির একটি অংশ বলেই উপলব্ধি করেছেন। এ জীবনকে পরম আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন এবং সেই আনন্দকে প্রকাশের মধ্য দিয়ে পাঠককেও তার শরীক করে তুলেছেন।

সহায়ক গ্রন্থ:

১.বিভূতিরচনাবলী ১-১২ খণ্ড/শ্রী গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রী চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত /মিত্র ও ঘোষ/কলিকাতা/১৯৭০-১৯৭২

২. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী; বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প, দে'জ পাবলিশিং, ৪র্থ সং, মাঘ ১৪১০, জানু.২০০৪, কলিকাতা

৩. রুশতী সেন/ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়/প:ব: বাংলা আকাদেমি/সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫/কলিকাতা

৪. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনের পরে দিন/মিত্র ও ঘোষ/ প্র. প্রকাশ - চৈত্র ১৩৯৪, কলিকাতা

৫. সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়/বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য/প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ-১৩৭৭, নাথ পাবলিশিং, কলিকাতা।

তথ্যপঞ্জী:

১. বিভূতিভূষণ অভিযাত্রিক এ বিভূতিভূষণ বন্ধু নীরদচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে জাঙ্গীপাড়া ভ্রমণের সময় নিজের বয়স সম্পর্কে বলেছেন— 'আমার তখন বয়স তেইশের বেশী নয়— মেয়েটি চৌদ্দ বছরের'। অতএব সালটা ১৯১৭ থেকে ধরা হবে। 'দিনের পর দিন'-পৃ.৭।

২. এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ১৯৪৩, ১৯৪৫ এবং ১৯৫০-এর দিনলিপির মধ্যে ১৯৪৫ এর ৯ মে থেকে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত লেখা দিনলিপি, 'অন্তরঙ্গ দিনলিপি' নামে পূর্বেই গ্রন্থিত হয়েছে। তবে বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত রচনায় গ্রন্থিত ১৯৪৫-এর দিনলিপিতে ১৩ জানুয়ারী ১৯৪৫ থেকে ৬ মে ১৯৪৫ পর্যন্ত ডায়েরী এবং ৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৫এর ডায়েরি আছে, যা 'অন্তরঙ্গ দিনলিপি'তে নেই। (তথ্য: রুশতী সেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

৩. বিভূতি রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, অপরাজিত পৃ. ১৮০।

৪, 'তৃণাঙ্কুর', 'দিনের পরে দিন', পৃ. ২৫১।

৫. 'ঊর্মিমুখর', 'দিনের পরে দিন', পৃ. ২৯৯।